সংবাদ

তারিখ ... 2 5 FEB ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে বিধিবদ্ধতার দুষ্টচক্র

অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম

শিক্ষা নামক মাধ্যমটিকে চালিকাশক্তি হিসেবে পেট্রল ঢেলে আলোকবর্তিকা জ্বেলে যারা নিবেদিত হয়ে কাজ করেন তারা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক। শিক্ষকের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের ও কর্ম কৌশলের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন ও উন্নতি। আমাদের দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ ডিগ্রি প্রদান পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত রয়েছে বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষকমণ্ডলীর বৃহৎ অংশ। মুক্ত বুদ্ধির চর্চা, জ্ঞান অন্বেষণ, সৃজন শক্তির বিকাশ, বিজ্ঞান মনস্ক দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বেসরকারি শিক্ষকরাই বৃহৎ অর্থে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল কাঠামোর সরকারি বিধি-বিধান মেনে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার এখতিয়ার রয়েছে প্রতিটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের। কিন্তু প্রাসঙ্গিক ও দুর্বোধ্য কিছু কারণে পরিচালনা পর্ষদ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যোগ্য শিক্ষক বহু ক্ষেত্রে নিয়োগ দিতে পারে না। ফলে শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে বিরাজ করে জগাখিচুড়ি অবস্থা। যা জাতীয় উন্নয়নে বাস্তব ক্ষেত্রে ডেকে আনছে অসারতা, ব্যর্থতা ও চরম নির্লিপ্ততা।

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ইত্যাদি যে কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেতে হলে প্রার্থীকে একাডেমিক যোগ্যতাসহ নিবন্ধনধারী হতে হবে। অতঃপর তীব্র প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষা মোকাবেলা করে উত্তীর্ণ হয়ে খুলতে পারে তার শিক্ষকতা জীবনের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ডায়েরি। উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর তার নিয়োগ তত্ত্ব যাছাই শেষে গ্রহণ করে বেতনাদি প্রদানের দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক জীবনের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ অবসরকালে পায় কল্যাণ ট্রাস্টের সুবিধাসহ অবসরকালীন অর্থনৈতিক সুবিধা।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় ঘন ঘন বিধি-বিধানের সংযোজন, বিয়োজনের ফলে তৈরি হচ্ছে শিক্ষকতা পেশায় নিয়মনীতির জটিলতা। অধিকাংশ বিজ্ঞজন মত পোষণ করেন বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য পিএসসির আদলে একটি নিয়োগ বোর্ড থাকা দরকার। শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয়, লাভজনক, সম্মানজনক, দায়িত্বশীল করার প্রয়োজনে একটি জটিলতার সমাধান দিতে গিয়ে টেনে আনবে অন্য একটি জটিলতা– এমন নীতি বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত নয়। যেমন প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে হলে প্রার্থীর থাকতে হবে সহকারী শিক্ষকতায় তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ শিক্ষকতা পেশায় পনের বছরের অভিজ্ঞতা। অনুরূপভাবে ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পেতে হলে সহকারী অধ্যাপক পদে তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ শিক্ষকতা পেশায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে পনের বছরের। সহকারী শিক্ষক বা সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়মনীতির মারপ্যাচের জন্য অনেকে পৌছতে পারেন না। পনের বছরের অধিক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সহকারী পদের জটিলতার কারণে প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না– এ জটিলতা থাকা সমীচীন নয়। আবার ইনক্রিমেন্ট বা পদোন্নতি নেই বিধায় আট-দশ বছর আগে-পরে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক একই স্কেলে অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে তাও নয় যৌক্তিক।

মাদ্রাসা নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধনধারী শিক্ষক পাওয়া যায় না বলে বহু প্রতিষ্ঠানে রয়েছে শিক্ষকের ঘাটতি। অনুরূপভাবে মহিলা শিক্ষক না পাওয়ায় পূরণ হচ্ছে না সরকারি বিধি-বিধানের ৩০% মহিলা নিয়োগের কোটা। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে ব্যর্থ হচ্ছে তাদের দৈনিক শিক্ষা কার্যক্রমের রুটিনের গতিকে ত্বরান্বিত করতে। শিক্ষার অগ্রগতি, উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে এসব জটিলতা মোটেই সুখপ্রদ নয়।

বাস্তবে যাই হোক তবুও বলতে হয়, পবিত্র জাতীয় সংবিধান দিয়েছে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি। নারীও কর্মে, ধর্মে, পেশাগতসহ সব পদে পুরুষদের সমতালে হাঁটাতে অগ্রহী। যদি তাই হয়, তা হলে প্রাইমারি নিয়োগে ৬০%, বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নিয়োগে ৩০% এবং বিসিএসে ১০% নারীর জন্য সংরক্ষিত কোটা বিলুপ্ত করা দরকার। নারী-পুরুষের জন্য নির্ধারিত একই মাপের সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষা উতরিয়ে আসতে পারলে চাকরি ক্ষেত্রে নারী রাখবে পা, এই মানসিক প্রস্তুতি সবার থাকা দরকার। নারী কেন প্রতিবন্ধী ছাড়া নিয়োগ ক্ষেত্রে কারও জন্য শিথিলযোগ্য মাপকাঠি থাকা উচিত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজের শিক্ষকরা প্রভাষক পদে নিয়োগ পেয়ে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করার পর সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপকের পথ পাড়ি দিয়ে অধ্যাপক পদমর্যাদায় পৌছাতে বেগ পেতে হয় না। বেসরকারি কলেজ-মাদ্রাসায় কর্মরত প্রভাষকরা ৭:২ রেশিওগত দ্বিধান অতিক্রম করে চরম ভাগ্যবান ছাড়া কেউ সহকারী অধ্যাপক পদে যেতে পারেন না। সহযোগী অধ্যাপকের পদটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত নেই। অতঃপর অধ্যাপক পদটি যেন সোনার হরিণ। বেসরকারি প্রভাষকরা হতে গোনা দুই-একজন অধ্যাপক পদটি পায় কি না সন্দেহ।

এদিকে এমপিওভুক্তির পর দুই বছর ও আট বছর চাকরির মেয়াদ পূর্তিতে উচ্চতর স্কেল ও পদোন্নতি পেয়ে আসছিল প্রভাষকরা। চারদলীয় জোট সরকার কি যেন কুচক্রান্তের অজুহাতে উচ্চতর স্কেল ও পদোন্নতির বিধিটিকে গলাটিপে গত্যা করেছে। ফলে আজকে নিয়োগ পেয়ে শিক্ষকটি যে বেতনাদি পাচ্ছে দশ বছর আগে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকটিও একই বেতন পাচ্ছে। এই অমানবিক বিষয়টিকে মেনে নেয়া যায়? ২০০২ বা ২০০৪-এ এমপিওভুক্ত ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষকে দেয়া হচ্ছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা কলেজের প্রভাষকের সমমর্যাদার বেতন স্কেল। তার এমপিওভুক্তির আগের শিক্ষকতা অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। এসব বিধি-বিধানের মারপ্যাচের কারণে বহু শিক্ষক হীনমন্যতায় ভুগছে। কেউ কেউ আত্মসন্তুষ্টির অভাবে শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। কেউ-বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে কোচিং বা টিউশনি নামক বাণিজ্যিক ব্যবসায়।

সবার বদ্ধমূল ধারণা, অতিমেধাবী নয় শুধু প্রথম, দ্বিতীয় স্থান অধিকারসহ চারটি প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত সার্টিফিকেটধারীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারে। শিক্ষা জীবনে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ডিগ্রিধারীরা এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার শিক্ষকতা পেশায় আসতে পারে এমন ধারণা হয় তো-বা কারও জানা নেই। শুধু তাই নয়, তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকটি তার পিএইচডি বা এমফিল ডিগ্রিটি কাজে লাগিয়ে শিক্ষাজীবনে ৪টি প্রথম বিভাগ নিয়ে নিয়োগ লাভকারী শিক্ষকের আগে পদোন্নতি পেয়ে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এমন কি প্রফেসরের পদটিও পেয়ে যাচ্ছে। অবাক ও আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা এখানেই শেষ নয় আরও আছে।

পদোন্নতি নীতিমালার ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকটি কোন প্রকার গবেষণামূলক প্রকাশনা ছাড়াই দুই বছরের মাথায় সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হতে পারে। অন্যদিকে ৪টি প্রথম বিভাগধারী শিক্ষককে একই সময়ে নিয়োগ পেয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে যেতে তিন বছরের অভিজ্ঞতার পথ পারি দিতে হয়। এক্ষেত্রে তৃতীয় বিভাগধারী ব্যক্তিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শুধু পিএইচডি ডিগ্রিটি ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ চাকরিটি যে শুধু নিচ্ছে তাই নয়, পদোন্নতিও পাচ্ছে নির্ধারিত সময়ের আগে। এই ধরনের শিক্ষকরা ৭ বছরের মাথায় সহযোগী অধ্যাপক ও ১২ বছর পর প্রফেসর হয়ে যান।

অন্যদিকে পাকাপোক্ত একাডেমিক যোগ্যতার সব স্তরে প্রথম শ্রেণী থাকা সত্ত্বেও সহযোগী অধ্যাপক হতে ১২ বছর এবং ২১ বছর অপেক্ষা করতে হয় প্রফেসর হতে। অর্থাৎ অধিমেধাবীরা উঁচু শিখরে উঠতে ধৈর্যের কাঠ পোড়াতে হচ্ছে। অথচ শিক্ষক হওয়ার মতো ফলাফল নেই যার, পিএইচডি ডিগ্রিটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পদোন্নতি পাচ্ছেন তিনি।

নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে এই যে মারপ্যাচের দুর্বলতা, তা উচ্চ শিক্ষাকে বিতর্কিত করে তুলছে। যে পিএইচডি ডিগ্রিটি পদোন্নতি ক্ষেত্রে ঢাল-তলোয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাও আজকাল অর্থের বিনিময়ে সহজলভ্য। অতএব শিক্ষকতা পেশায় দক্ষ শিক্ষক পাওয়ার ব্যাপারে যোগ্যতার মাপকাঠি একটি অযৌক্তিক জটিলতা তৈরি করছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। যা শিক্ষকতা পেশার একটি দুর্বল দিক নির্দেশ করে।

জাতিকে দক্ষ জনশক্তি উপহার দিতে হলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রয়োজনে শিক্ষক নিয়োগ বিধিতে সংস্কার আনা প্রয়োজন। দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার বা শিক্ষার্থীর গুণগত মান পরিবর্তন সম্ভব নয়। জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে শিক্ষার নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে দক্ষ, অভিজ্ঞ, মেধাবী, শিক্ষক নিয়োগে সহায়ক, কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দাবিদার এ প্রত্যাশা সবার। সরকারের উচিত হবে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি মাত্র ফ্রেম য়ার্কের আওতায় আনা।

[লেখক : শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব]